সহযোগী হও প্রতিপক্ষ হয়ো না

মূল: দা'য়ী-এ ইসলাম
হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী
খলিফা, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)
পরিচালক: জমিয়তে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, মুজাফফরনগর, ভারত

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
Email- ahmadjubaer@yahoo.com

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.hilfulfujul.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর-২০১৩ ই.

সহযোগী হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না

* **প্রকাশক.** আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
* **স্বত্ব.** পরিবর্তন, পরিবর্ধন না করার শর্তে, অনুবাদকের লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবে। * **প্রচ্ছদ.** নাজমুল হায়দার * **কম্পোজ.** আবু আমাতুল্লাহ *
প্রাপ্তিস্থান.
ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট মান্ডা,মুগদা,ঢাকা-১২১৪, বাংলাবাজার, বাইতুলমোকাররম সহ দেশের সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী সমূহ।

নির্ধারিত মূল্য. ১৫ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় **'সহযোগী হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না'** বইটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি। হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দা তাঁর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে ইসলামের পথে উৎসাহিত হয় এবং অন্যদের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যম হয়, সেই উসিলায় আল্লাহ যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন। সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুলত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৫-০৯-২০১৩ ইং

অনুবাদকের কথা

সমস্ড় প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি কোনো আবেদন ছাড়াই আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবিয়্যিন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়া সালামের ওপর ও তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবা (রাঃ) এর ওপর।

২০০৩ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি পরিক্ষা দিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ফুলাতে, সেখানেই প্রথম পরিচয় হয় হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দাঃ বাঃ) এর সাথে। তাঁর সুন্দর আচরণে আমি খুবই প্রভাবিত হই এবং তার সাথে এসলাহী সম্পর্ক করতে সিদ্ধান্ত নিই। তিনি নিজ হাতে আমাদের মেহমানদারী করলেন সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। বিদায় পর্বে আমাদের প্রত্যেককে কিছু বই হাদিয়া দেন, সেই বইগুলোর মধ্যে বর্তমান বই **সহযোগী হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না** (রফীক বনো, ফরীক নেহী) টিও ছিল। বইটি পড়ে খুবই উপকৃত হলাম। ইচ্ছা জাগলো এই কথা গুলো আমার দেশের মানুষেরও জানা উচিত। এই লেখাটি মাসিক 'আলকাওসার' পত্রিকায় প্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির কলেবর বেশী ছোট হওয়ায় এর সাথে বিষয় বস্তুও সাথে মিল রেখে, বাবরী মসজিদ যিনি সর্ব প্রথম কুদাল তুলে নিয়েছিল তিনিএখন মুসলমান। তার সক্ষাতকারটি সংযোগ করে দিয়েছি। যা অথমের অনুদিত আলোর পথে থেকে নেয়া হয়েছে। বন্ধুদের পক্ষ থেকে বার বার তাগিত দেয়া হচ্ছিল এই লেখাটি পুস্ড়িকা আকাওে প্রকাশ করার জন্য।

আলহামদুলিল্লাহ পুস্ড়িকাটি প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছন। তার মধ্যে কয়েক জনের নাম

না নিয়েই পারছিনা। বইটি প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন আমার বন্ধুবর মাও.এমদাদুল হক তাসনিম আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। প্রকাশ করলেন জনাব আলহাজ তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী ও এব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন আলহাজ এ,কে,এম ফজলুল করিম ও আলহাজ্ব নাসির সাহেব সহ সকলকে আলাহপাক দীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন।

আমি শুরুতেই বলেছি লেখা লেখির ময়দানে আমি শিশু শ্রেনির ছাত্র। আমরা চেষ্টা করেছি এরপরও যদি কোনো ভাই বোনের চোখে ভুলত্রুটি দৃষ্টিপাত হয়, তাহলে জানালে খুসি হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশা আলাহ।

ইতি

যুবায়ের আহমদ

ইসলামী দাওয়া ইনস্টিটিউট

২২/০৯/১৩ইং

সহযোগী হও, প্রতিপক্ষ হয়ো না

সামনে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, দ্বীনের বিভিন্ন শাখার কর্মীদের মাঝে পরস্পর সু-সম্পর্ক ও সহযোগিতার মানসিকতা বিলীন হয়ে গেছে। এমনকি পরিস্থিতি এই দাঁড়িয়েছে যে, কোনো এক শাখার একই ব্যবস্থাপনাধীন লোকদের মাঝেও পরস্পর বড় ধরনের বিরোধ দেখা দেয়। জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় হয় অন্যকে খাটো করে নিজের অবস্থান উর্ধ্বে তুলে ধরার মধ্যে। ঈমান ও কুফর, হক ও বতিলের দ্বন্দ্বের পরিবর্তে শুরু হয় অন্য এক লড়াই। প্রত্যেকের ধারণা আমি যা কিছু করছি বা আমার দ্বারা যে কাজ হচ্ছে, সেটিই কাজ, আর সেটিই হক ও সত্য। অন্যরা যা কিছু করছে তা কোনো কাজই না। এভাবে নিজের কাজের প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যের কাজকে তুচ্ছ মনে করার মানুসিকতাটাই মুখ্য হয়ে ওঠেছে।

আমাদের মাঝে অপর কোনো শাখার বা সংস্থার কর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও স্বীকৃতির মানসিকতা হারিয়ে গেছে। যার ফলে আল্লাহপ্রদত্ত মূল্যবান যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতাগুলো অসৎ ও অকল্যানকর কাজে নষ্ট হচ্ছে। এজন্য জাতির হৃদয়বান ব্যক্তিদের ও দ্বীনের খাদেমদের চেষ্টা করতে হবে এই ব্যাধি দূর করার। সেই সৌভাগ্যবানকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের কোনো একটি অংশে খেদমত করার সুযোগ দিয়েছেন, তার কর্তব্য, এই ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করা।

আমেরিকায় অনেক ব্যক্তি ও সংগঠন ইসলামের দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা করছেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) কে তাঁর আমেরিকার সফরে ওখানকার হিতাকাঙ্খীগণ সেদেশের দ্বীনের কর্মীদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগীতার অভাবের কথা জানিয়ে চিকিৎসার আবেদন জানালে হযরত মাওলানা (রহ.) যে আলোচনা করেছিলেন তার সারমর্ম তুলে ধরছি।

“দুটি বস্তুকে একত্রিত করার জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। দুটি কাগজকে একসাথে মিলানোর জন্য গাম ব্যবহারের করতে হয়। একটি

কাঠকে অন্য একটি কাঠের সাথে যুক্ত করার জন্য বিশেষ ধরনের গাম ব্যবহার করা হয়। তদ্রূপ অন্তরের সাথে অন্তর জোড়া লাগানোর জন্য এক প্রকার গাম আছে। আর তা হলো ইখলাস এবং আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক। ইখলাস ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই হতে পারে পরস্পর মিলন। এক অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের মাধ্যমে একথা স্পষ্ট হয়, দ্বীনের বিভিন্ন শাখার কর্মীদের মাঝে পরস্পরের দূরত্ব ও সম্পর্কের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, ইখলাস কম থাকা।"

এখলাছের নিদর্শন ও তা চেনার উপায় সম্পর্কে হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ রহ.- এর একটি বানী আমাদের জন্য আলোকবর্তিকা হতে পারে।

তিনি বলেন, 'দ্বীনের একাটি মৌলিক স্বীকৃত নীতি হল ইখলাস ছাড়া কোনো আমল গ্রহনযোগ্য হয় না। এখলাসের মাপকাঠি হল, দ্বীনের প্রতিটি কর্মীর প্রতি তার দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভতি নিজের অন্তরে সৃষ্টি হওয়া। যদি কারো অন্তরে অন্যের দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভতি সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝা যাবে তার অন্তরে ইখলাস আছে, অন্যথায় নেই।

যদি অন্তরে প্রতিহিংসা সৃষ্টি হয়, মনে করে তার প্রতিষ্ঠান কেন চলছে? সে কেন কাজ করছে? অন্যের মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পাদিত হলে সেটাকে কাজই মনে করা হয়না। ব্যাস! কাজ তো সেটিই যা আমি করছি। যদি নিয়ত এমনই হয়, তাহলে তার জন্য উচিৎ সে যেন তার নিয়তকে শুদ্ধ করে, অন্যথায় কাজ বন্ধ করে দেয়।

ইখলাস হল, প্রত্যেকেই দ্বীনের প্রতিটি কাজকে নিজের কাজ মনে করবে। মনে করুন, আপনার একটি বিডিং তৈরী হচ্ছে। কেউ এসে সেখানে শ্রম দিতে লাগল, বালির সাথে সিমেন্ট মিলাতে শুরু করল, ইট এগিয়ে দিল, আপনি কি তার এটাকে তার অনুগ্রহ বলে মনে করবেন না? আপনি তো মনে করবেন এ কাজগুলো আমারই ছিল, ঐ ব্যক্তি আমার হয়ে আমার কাজটা করে দিচ্ছে। আল্লামা শওকানী (রহ.)ও এই মূলনীতিটি উল্লেখ করে বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোথাও দ্বীনের কোনো শাখায় কাজ করতেথাকে, আর সেখানে তার চেয়েও ভাল কোনো কর্মী চলে আসে, তাহলে এখলাসের পরিচয় হল আগত ব্যক্তিকে অনুগ্রহকারী মনে করে কাজের সুযোগ দেবে এবং নিজে অন্যস্থানে কাজ শুরু করবে। আগত কর্মীকে পূর্ণ সহযোগীতা করবে। মোটকথা, দ্বীনী প্রতিষ্ঠান ও তার

কর্মকর্তাদের মাঝে পরস্পর সম্পর্ক ও সহযোগীতার মূল ভিত্তি হতে পারে এখালাস ও আল্লাহর সাথে মজবুত সম্পর্ক।

এখালাস অন্তরের এমন এক অবস্থার নাম, যা প্রতিটি মানুষের থাকা উচিৎ। অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখার হুকুমও শরিয়ত দিয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তার উপর দৃঢ় থাকা ইখতিয়ার ও সামর্থের ভিতরের বিষয়। কখনো কখনো মানুষক কাজের শুরুতে খুবই মুখলিস থাকে। কিন্তু পরে ইখলাস কমতে কমতে শেষ হয়ে যায়। আবার কখনো এর বিপরীতও ঘটে। কাজের শুরুতে ইখলাস থাকে না, পরে ধীরে ধীরে ইখলাস নসিব হয়ে যায়। অন্তরে ইখলাস সৃষ্টি করা এবং তা বজায় রাখার জন্য অভিজ্ঞতার আলোকে একটি পদ্ধতির কথা বলছি।

অন্যের সাথে মিলে কাজ করবে এবং অন্যের পেছনে পেছনে থাকার মেজাজ তৈরী করেবে। মানুষকে নিজের সাথে জুড়ানোর চেষ্টা করবে না। আজকাল দ্বীনের খাদেম এবং ধর্মীয় সংগঠনে কর্মীরা চেষ্টা করেন, সকলেই যেন আমার দলে চলে আসে এবং আমার পিছনে থেকে কাজ করে। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর ভাষ্যমতে " প্রত্যেকেই অনুসণীয় হতে চায়, তাহলে অনুসারী আসবে কোত্থেকে।" এজন্য নিজেকে মুক্তাদী (অনুসরণকারী) বানান। অনুসরনীয় সাজা থেকে বিরত থাকুন। অনুসারী হয়ে অন্যের সাথে মিলে কাজ করার মধ্যে শুরুতে ইখলাস থাকে এবং ধীরে ধীরে তা বারতেই থাকে।

দ্বীনের যেই কর্মী নিজেকে অনুসৃত বানাতে চায় এবং সকল মানুষকে নিজেন সাথে মিলাতে চেষ্টা করে। প্রথমত তার অন্তরে ইখলাসই থাকে না। আর যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটাও আস্ড়ে আস্ড়ে চলে যায়। এর বিপরীত অনুসারী হয়ে অন্যের সাথে মিলে কাজ কারার মধ্যে শুরুতেই ইখলাস থাকে এবং ধীরে ধীরে তা বারতেই থাকে। শুরু থেকে যদি ইখলাস না-ও থাকে, একপর্যায়ে ইখলাস সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই দ্বীনের প্রতিটি সেবককে অন্যের সাথে মিলে ও পিছনে থেকে কাজ করার পরামর্শ দেয়া উচিত। এতে যদিও অন্তরে খুব কষ্ট লাগে কিন্তু এর মধ্যেই রয়েছে বরকত ও নিরাপত্তা। যে অন্যের সাথে মিলে কাজ করতে পারে সে দ্বীনের যে কোনো খাদেমের সহযোগী হয়ে থাকে, প্রতিপক্ষ হয় না।

হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. এর একটি বাণী আমাদের জন্য

আলোকবর্তিকা।

"দ্বীনের প্রতিটি কর্মীর সহযোগী হও, প্রতিবন্ধক নও"

আফসোস! মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত নিমগ্নতা ও জীবিকার কাজে লেগে থাকে তখন অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসার সাথে একে অপরের কাজে সহযোগী হয়। সেই লোকগুলোই যখন দ্বীনের কাজে যোগ দেয় তখন তৈরী হয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা। অথচ দ্বীন তাদের মাঝে মিলন সৃষ্টির জন্যই এসেছে। এ ব্যাপারে কুর'আনে পাক ঘোষণা দেয়

*وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

অর্থ: "আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখ এবং পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখ, এক সময় তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরসমূহকে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সৎ পথ পেতে পার।"

–সূরা আলে ইমরান (৩) :১০৩

কখনো কখনো কোনো মুখলিস ব্যক্তিও শিকার হয়ে যান এই ভ্রান্তির। দ্বীনের কোনো বিশেষ শাখায়, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, কোনো সংগঠন অথবা সংস্থার সাথে মিলে, আথবা কোনো বড় মুরব্বীর সম্মান ও ভালোবাসায় তার অধীনে কোনো একজন কাজ করছে । এখন এ কর্মীর মনে আগ্রহ জাগল, অন্য লোকেরাও যেন দ্বীনের ওই শাখায়, ওই সংগঠনের আওতায় কিংবা ওই শাইখের অধীনে কাজ করতে চলে আসে। একদিক থেকে এটা মানুষের স্বভাবজাত অনুভুতি। তবে এ আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে যদি এ মনোভাবও সৃষ্টি হয় যে, অন্য মানুষ তার নিজস্ব দ্বীনী কাজ ছেড়ে দিক, অথবা সেই কাজ বাধাপ্রাপ্ত হোক , তাহলে সেটি সঠিক নয়। আর এটা

সম্ভবও নয়।ধরুন আপনি যদি মনে করেন আপনার পিতাকে যেহেতু আপনি পিতা মনে করেন তাই অন্যরাও নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে আপনার পিতাকে পিতা হিসেবে গ্রহন করবেন অথবা সকলেই নিজের মামাকে ছেড়ে আপনার মামাকে মামা বলে ডাকতে থাকবেন।এটাতোএকটা ভুল চিন্তা।

আপনি দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় এবং বিভিন্ন মাধ্যমে দ্বীনের কোনো খাদেমকে সহযোগিতা করবেন এবং নিজের কাজে তার সহযোগিতাও কামনা করবেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে তার কাজ থেকে সরিয়ে নিজের কাজের সাথে যুক্ত করা কোনোভাবেই সমীচীন নয়। কারন তিনি ওই কাজটির সাথে যুক্ত হয়েছেন অনেক চেষ্টা-সাধনার পর। দ্বীনের কাজের জন্য নিজের ব্যক্তিগত বিভিন্ন কজের চাপের ভিতরে একটি তরতীব ঠিক করেছেন। আপনি যদি তাকে তার কাজ থেকে সরিয়ে দেন, তাহলে শয়তান এবং নফস তাকে সব ধরনের কাজ থেকেই সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে।

এটা তো জরুরী নয় যে, তার অবস্থা আপনার কর্মপদ্ধতির সাথে পুরোপুরি মিলে যাবে। বরং অধিকাংশ সময় এমন হয়, কেউ যে পদ্ধতিতে দ্বীনের কাজ করছে, যখন সেটাকে ছেড়ে দেয়, তখন অন্য কাজের সাথে নিজেকে আর মিলাতে পারে না। এমন অবস্থায় একুল-ওকুল উভয়ই ছুটে যায়।

একারণেই দ্বীনের কেনো খাদেম নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠনের সাথে লেগে থাকলে তাকে সে কাজ থেকে পৃথক করা কোনোভাবেই কল্যাণকর নয়। তাকে তার কাজের সাথে লাগিয়ে রেখেই আপনি আপনার জন্য তার পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশা করতে পারেন। উত্তম পন্থা হল, আপনার কর্মতৎপরতা ও সংগঠনের সহযোগীতার জন্য এমন ব্যক্তিদেরকেই নির্বাচন করুন, যারা দ্বীনের কোন শাখায়ই এখনও সম্পৃক্ত নয়। এধরনের লোকদেরকে দ্বীনি কাজের সাথে লাগিয়ে দেয়া হবে বড় ধরনের খেদমত।

প্রতিটি মানুষের মাঝে কিছু সৌন্দর্য ও সুকর্ম থাকে, সাথে সাথে থাকে কিছু অপরিপক্কতা ও অক্ষমতাও। পাপ ও দুর্বলতা থেকে তো শুধু নবীরাই মুক্ত থাকেন। আমাদের মজলিসগুলোতে বসলেই পরস্পর বৈরিতার কারণে গীবতের চর্চা অবধারিত হয়ে থাকে। এ জন্য প্রয়োজন দ্বীনের প্রত্যেক কর্মী অপর কর্মীর কাজকে স্বীকার করা। তাদের অন্তরকে প্রশস্ড় করা। এজন্য অন্যের দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ার অনুভূতি প্রথমে নিজের থেকে শুরু করতে হবে। এরপর কাজের সহযোগীদের মাঝে ধন্যবাদ দেয়ার অভ্যাস গড়ে

তুলতে হবে। আর বাধা দিতে হবে অশোভনীয় বাক্য থেকে। এর ফলে পরস্পরের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। এতে জাতির গ্রহনযোগ্য একটি দলের যোগ্যতা সঠিক খাতে ব্যবহৃত হবে। এই মুমিনরাই সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর বাস্ড়ব নমুনা হতে পারবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয় সাল্লাম বলেছেন,"এক মুমিন আরেক মুমিনের জন্য দেয়ালের ইটের মতো,একে অন্যের শক্তি যোগাবে।"

(বি: দ্র: উপরোল্লেখিত রচনাটি আরমুগানের যেই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. এর বক্তব্যের নির্বাচিত একটি অংশও প্রকাশ করা হয়েছিল। বক্ষমান নিবন্ধ আর ঐ বক্তব্যের অংশ টুকুর বিষয়বস্তু অভিন্ন হওয়ায় সেটিও এখানে সংযুক্ত করছি।)

পরস্পরের ঐক্য এবং একজন অপরজনকে নিজের সাথে মিলানো এবং কাছে টানার জন্য এখন পর্যন্ত কোনো বস্তুত দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। বরং ঐক্য ও এত্তেবা এটা আল্লাহপাকের খাছ তৌফিক ও বিশেষ পুরস্কার। যেনম : কুরআনে হাকিমে আল্লাহ তাআলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন,

"হে নবী! আপনি যদি পুরা দুনিয়ার সকল খাজানা গুলো খরচ করে দেন। তাহলে ঐ সাহাবাদের অন্তরের ভালবাসা ও মহব্বত ঐক্য ও সমৃদ্ধ তৈরী করতে পারবেন না।

বরং আল্লাহ তাআলাই তার অনুগ্রহে তাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আনফাল –৬৩)

বাহ্যত ঐক্যের উপলক্ষ হতে পারে কেবল ভীতির অনুভূতি। যখন ক্ষয়ক্ষতি ও ভীতির অনুভূতি জেগে উঠে মানুষ আপনা-আপনিই ঐক্যবদ্ধ হয়। আমরা যারা হিন্দুস্থানে আছি, পরস্পরে বিক্ষিপ্ততার স্বীকার হয়ে একে অপরের মাঝে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি করছি, এর কারণ হলো বিপদের আশংকা আমাদের মাঝে নেই।

আল্লাহর শোকর স্বভাবগত ভাবে আমি নিরাশ নই। এই কঠিন যুগেও, মানুষ যখন ইসলাম ও মুসলমানকে বিপদের সম্মুখীন মানে করছে এবং হিন্দুস্থানেও স্পেনের মতো অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করছে, আমি এমন মুহূর্তেও নিরাশ হইনি। কিন্তু পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের ফলে আমার অনুভূতি

এই যে, মুসলমানের অবস্থা শোচনীয় হতে চলেছে। অবস্থা তো এ পর্যায়ের চলেগেছে যে, যদি কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা কোনো সংগঠনের সাথে অপর সংগঠনের বিরোধিতার বাস্ড়ব মাত্রা থাকে এক ভাগ তাহলে সে বিরোধিতাটাই প্রকাশিত হচ্ছে শতভাগ ক্ষেত্রে।

আফসোস! আমারা নিজেদের মহত্বগিরীর করণে, অন্যের সম্মানকে ধূলিসাৎ করে দেয়ার হিন চেষ্টা করছি। নিজেদের মধ্যে বিরোধিতার যেই আচরণ করি, প্রতিবেশী জাতিদের বেলায় এর এক চতুর্থাংশও পাওয়া যায় না। যেমন গান্ধির সাথে মতবেদ থাকা সত্বেও তাকে তুচ্ছ করা, বদনাম করা, হিন করার অপচেষ্টা করা হয়না। বিশেষত: আমাদের অঙ্গনের একটি ব্যধি হল বিরোধীতায় সীমাতিরঞ্জন করা। আমরা এমন একজাতি, উত্তম চরিত্রের এক মহান ইতিহাস যাদের আছে। এর পরও বিরোধের এই অবস্থাটি খুবই দুঃখ জনক। কোনো ব্যক্তি বা দলের সাথে যদি সামান্যতম বিরোধ থাকে,তাহলে তাকে ছাড় দেয়ার পরিবর্তে অগ্নিবর্ষার মতো তার বিরোধিতা করতে থাকি। কোনো নেতৃত্ব, ব্যক্তিত্ব, অথবা প্রতিষ্ঠানের সম্মান এবং তার সফলতাকে স্বীকার করার স্পৃহা বিলীন হতে চলেছে। সামষ্টিক ভাবে পরস্পরে সহযোগিতার যোগ্যতা মুসলমানদের থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে। কাওকে একটু এগিয়ে যেতে দেখলে তার বিরোধ্যে পুরো শক্তি ব্যয় করা আমাদের স্বভাবে পরিনত হয়ে গেছে। এমনও নয় যে, নীতিগত ভাবে কঠোর ইখতিলাফ ও বিরোধ রয়েছে। বরং দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধকে মূল বানিয়ে ফাসাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। পরিবেষ থেকে চক্ষুবন্ধ করে ফেলা এবং পরিস্থিতিকে অনুকুল করার চেষ্টা না করা আমাদের অভ্যাসে পরিনত হয়ে গেছে। আমরা না অবস্থা বুঝার চেষ্টা করি, না দেশের দিকে খেয়াল করে কখনো একথা চিন্তা করি যে, দেশকে আমাদের কিছু দেওয়ার রয়েছে।

আমাদের অবস্থা একটি দীপের মতো, বরং দীপের মধ্যে ছোট্ট দ্বীপের মতো হয়ে গেছে। ইসলামী জাতি নিজেই একটি দ্বীপ। আবার এই দ্বীপের মধ্যে একটি দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেক দল, বরং প্রতিটি সংগঠন পৃথক পৃথক দ্বীপে পরিনত হয়েছে। আমার খুব ভয় হয়, এই দেশ ও দেশবাসীর কী হবে? এখন পর্যন্ত দিয়ানতদারী এবং নিষ্ঠার সাথে কোনো পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছেনা, যাতে কোনো প্রতিষ্ঠান, জামাত, সংগঠন, অথবা কোনো ব্যক্তির বাস্ড়ব উপকারিতা ও তাদের গুন ও মূল্য

যথার্থ উপায়ে অনুধাবন করা যেতে পারে। এখন পর্যন্ত এর কোনো চেষ্টাও করা হয়নি যে, বেশিরভাগ মানুষ বাস্ড়বিক ভাবে আমাদেরকে বুঝতে পারে এবং আমাদের উপকারিতা ও প্রয়োজন অনুভব করতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের পরস্পর মিলে মিশে দ্বীনের কাজ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

মাস্টার মুহাম্মদ আমের সাহেব (বলবীর সিং)-এর সাক্ষাৎকার

সকল মুসলমানের কাছে আমার একটিই নিবেদন, আর তাহল, নিজের জীবনের লক্ষ্য কী তা জেনে এবং ইসলামকে মানবতার আমানত মনে করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিই। পৌঁছে দেবার কথা ভাবি। কেবল ইসলামের প্রতি দুশমনীর কারণে তার থেকে বদলা নেবার প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহিত না হই। আহমদ ভাই! আমি একথা একেবারে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাবরী মসজিদ শাহাদতে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিব সেনা, বজরং দলের সদস্যসহ সকল হিন্দু যদি এটা জানত যে, ইসলাম কী? মুসলমান কাকে বলে? কুরআনুল করীম কী? মসজিদ আসলে কোন বস্তুর নাম! তাহলে মসজিদ ভাঙার প্রশ্নই উঠতো না। তাদের সকলেই মসজিদ বানাবার কথা ভাবতো। আমি আমার প্রবল প্রত্যয় থেকে বলছি, বাল থ্যাকার, উইরে কুঠিয়ার, যদি ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মর্মবাণী জানতে পারে, এবং জানতে পারে যে, ইসলাম (কেবল মুসলমানদের নয়) আমাদেরও ধর্ম, এটি আমাদের দরকার। তাহলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ খরচে বাবরী মসজিদ পুনর্বার নির্মাণ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য মনে করত।

মাস্টার মুহাম্মদ আমের. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আহমদ আওয়াহ. ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন. মাস্টার সাহেব! অনেক দিন থেকেই আমার ওপর আব্বার নির্দেশ

ছিল 'আরমুগান'-এর জন্য আপনার একটি সাক্ষাৎকার যেন গ্রহণ করি। ভালোই হলো যে, আজ আপনি এসে গেছেন। এ সুযোগে আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

আমের : আহমদ ভাই! আপনি আমার মনের কথা বলেছেন। যখন থেকে 'আরমুগান' পত্রিকায় নওমুসলিমদের সাক্ষাৎকার ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, তখন থেকেই আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে আমার ইসলাম কবুলের ঘটনাটি এতে ছাপা হোক। এজন্য নয় যে, আমার নাম এতে ছাপা হবে, বরং এজন্য যে, যাতে করে যাঁরা দাওয়াতের কাজ করছেন তাঁরা অনুপ্রাণিত হন, তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়ার সামনে মেহেরবান মালিক ও হেদায়েতদানকারী মহাপ্রভুর অসীম দয়া ও করুণার একটি উদাহরণ এসে যায়। আর যাঁরা দাওয়াতের ময়দানে কাজ করছেন তাঁরা যেন জানতে পারেন যে, যখন এ ধরনের আহম্মক ও নির্বোধ, যে তাঁর বরকতময় ঘর ধসিয়েছিল, তাকেই যদি আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দ্বারা ধন্য করতে পারেন তখন শরীফ ও ভদ্র-সজ্জন সাদাসিধে মানুষের পক্ষে হেদায়েত পাওয়া কঠিন হবে কেন? তাদের হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য জুটবে না কেন?

প্রশ্ন. আপনি আপনার খান্দানের পরিচয় দিন।

উত্তর. হরিয়ানা প্রদেশের পানিপথ জেলার একটি গ্রামে আমার অধিবাস। ১৯৭০ সালের ৬ ডিসেম্বর এক রাজপুত্র পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতা একজন কৃষক হবার সাথে সাথে একটি প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টারও ছিলেন। তিনি খুব ভালো মানুষ ছিলেন এবং মানুষকে ভালোবাসা তাঁর ধর্ম ছিল। কারও উপর জুলুম-নিপীড়ন; তা সে যে কোনো ধরনেরই হোক, তাঁর মনোবেদনার কারণ ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের সময়কার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তিনি স্বচক্ষে দেখেছিলেন। তিনি তা খুবই মর্মবেদনার সঙ্গে আলোচনা করতেন এবং সে সময়কার ব্যাপক মুসলিম হত্যাকে দেশের জন্য বড় ধরনের কলঙ্ক মনে করতেন। অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে পুনর্বাসনের ব্যাপারে তিনি খুবই সাহায্য করেছেন। তিনি তাঁর স্কুলে মুসলমান ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। জন্মসূত্রে আমার নাম বলবীর সিং। গ্রামের স্কুল থেকে পাস করে আমি হাই স্কুলে ভর্তি হই। ম্যাট্রিক পাস করে পানিপথে গিয়ে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি হই। বুম্বাইয়ের পর পানিপথ ছিল শিবসেনার সবচে'

মজবুত কেন্দ্র। বিশেষ করে যুবক শ্রেণী ও স্কুলের লোকেরা শিবসেনার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিল। ওখানে অনেক শিব সৈনিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং আমিও পানিপথ শাখায় আমার নাম লেখাই।

পানিপথের ইতিহাস তুলে ধরে সেখানকার যুবকদের মধ্যে মুসলমানদের বিশেষ করে সম্রাট বাবর ও অপরাপর মুলিম সম্রাটদের বিরুদ্ধে বিরাট ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ান হত। আমার পিতা যখন জানতে পারলেন যে, আমি শিবসেনায় নাম লিখিয়েছি তখন তিনি আমাকে খুব বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তিনি আমাকে ইতিহাসের সূত্র ধরে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সম্রাট বাবর বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গযেবের শাসনামলের ন্যায় ও ইনসাফ এবং অমুসলিমদের সঙ্গে কৃত তাঁর আচরণের কাহিনী তিনি আমাকে শোনান এবং আমাকে বোঝতে চেষ্টা করেন, ইংরেজরা ভুল ও বিকৃত ইতিহাস আমাদেরকে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই বাধাবার এবং দেশকে দুর্বল করবার জন্য সৃষ্টি করেছিল। তিনি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময়কার জুলুম-নিপীড়ন, হত্যা ও ধ্বংসাত্মক ঘটনাবলী শুনিয়ে আমাকে শিবসেনার যাবতীয় কর্মকা" থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আমার পিতার সেসব চেষ্টা বিফলে যায়। আমার উপলব্ধিতে কোন কিছুই ধরা পড়েনি।

প্রশ্ন. ফুলাত থাকাকালে বাবরী মসজিদ শহীদ করার ক্ষেত্রে আপনার অংশগ্রহণের কথা শুনিয়েছিলেন। এবার একটু বিস্ড়ারিতভাবে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।

উত্তর. ঘটনাটি এরকম ৯০ সালে লালকৃষ্ণ আদভানিজীর রথযাত্রায় আমাকে পানিপথের কর্মসূচী সফল করার ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। রথযাত্রায় ঐসব দায়িত্বশীল নেতৃবর্গ আমাদের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে দেন। আমি শিবজীর নামে শপথ গ্রহণ করি যে, যাই কিছু ঘটুক না কেন আর কেউ কিছু করুক আর নাই করুক, আমি একাই গিয়ে রাম মন্দিরের ওপর থেকে জুলুম করে চাপিয়ে দেওয়া (মসজিদরূপ) অবকাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবই। এ যাত্রায় আমার কর্মতৎপরতার দরূন আমাকে শিবসেনার যুব শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত করা হয় । আমি আমার যুব টিম নিয়ে ৩০ অক্টোবর অযোধ্যায় যাই। পথিমধ্যে পুলিশ আমাদেরকে ফয়েযাবাদে থামিয়ে দেয়। এতদসত্ত্বেও আমি এবং আমার কিছু সাথী কোন প্রকার গা বাঁচিয়ে অযোধ্যায় গিয়ে

পৌছি। বহু চেষ্টা করেও আমি বাবরী মসজিদের কাছে পৌছুতে পারলাম না। এর ফলে আমার শরীরে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন আরও জ্বলে ওঠে।

আমি আমার সাথীদেরকে বারবার বলছিলাম এরকম জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। রামের জন্মভূমিতে আরব লুটেরাদের কারণে রামভক্তদের ওপর গুলি চলবে, এ কেমন অন্যায় ও জুলুম! আমার খুব রাগ হচ্ছিল। আমি রাগে ক্ষোভে ফুসছিলাম। কখনো মনে হচ্ছিল যে, আমি নিজেকেই শেষ করে দেই। আমি আত্মহত্যা করি। সারা দেশে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছিল। আমি সেদিনের জন্য খুবই অস্থির ছিলাম যেন আমার সুযোগ মিলে যায় আর আমি নিজ হাতে বাবরী মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেই। এভাবে একদিন দু'দিন করে সেই অপেক্ষার দিনটিও কাছে এসে পড়ল, যেদিন্টাকে আমি সে সময় খুশির দিন, আনন্দের দিন ভাবতাম। আমি আমার কিছু আবেগ-দীপ্ত সাথীকে নিয়ে ৯২ সালের ১ ডিসেম্বর প্রথমে অযোধ্যা যাই। আমার সাথীদের মধ্যে সোনীপথের নিকটবর্তী জাটদের একটি গ্রামের যোগীন্দর পাল নামক এক যুবকও ছিল। সে ছিল আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার পিতা ছিল একজন বিরাট জমিদার। জমিদার হলেও তিনি মানুষকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে অযোধ্যা যেতে বাধা দেন। তার বড় চাচাও তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে কারোর বাধা মানেনি।

আমরা ৬ ডিসেম্বরের আগের রাত্রে বাবরী মসজিদের একবারে কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছি এবং বাবরী মসজিদের সামনে কিছু মুসলমানদের বাড়ির ছাদে রাত কাটাই। আমার বারবার মনে হত, না জানি আমাদেরকে ৩০ অক্টোবরের মতো আজও এই 'শুভ' কাজ থেকে বঞ্চিত হতে হয়! কয়েকবারই মনে হয়েছে, লীডার না জানি কী করেন, আমাদের নিজেদের গিয়েই কর সেবা শুরু করা উচিত। কিন্তু আমাদের সঞ্চালক আমাদেরকে বাধা দিলেন এবং শৃংখলার সঙ্গে থাকতে বললেন। আমি তাঁর ভাষণ শুনতে শুনতে ঘরের ছাদ থেকে নেমে এলাম এবং কোদাল হাতে বাবরী মসজিদ ভাঙতে অগ্রসর হলাম।

আমার মনস্কামনা পূরণের সময় এসে গেল। আমি মাঝের গম্বুজটির ওপর কোদাল দিয়ে আঘাত হানলাম এবং ভগবান রামের নামে জোরে জোরে ধ্বনি দিলাম। দেখতে না দেখতেই মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। মসজিদ ভেঙে পড়ার আগেই আমরা নিচে নেমে পড়ি। আমরা খুবই

আনন্দিত ছিলাম। রাম লীলা লাগানোর পর তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে আমরা আমাদের বাড়ি-ঘরে ফিরে এলাম, সাথে করে নিয়ে এলাম মসজিদের দু'টুকরো করে ইট, যা আমরা খুশিমনে আমাদের পানিপথের সাথীদের দেখালাম। তারা আমাদের পিঠ চাপড়ে আমাদের কৃতিত্বে আনন্দ প্রকাশ করল। শিবসেনার দফতরেও দু'টো ইট রেখে দেওয়া হয়। এরপর এক বিরাট সভা হয় এবং সকলেই তাদের বক্তৃতায় অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যে, আমাদের পরম গর্ব, পানিপথের নওজোয়ান শিবসৈনিক রামের প্রতি ভক্তিপ্রযুক্ত সর্ব-প্রথম কোদাল চালিয়েছিল। আমি আমার বাড়ি গিয়েও অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে একথা বলে ছিলাম।

আমার পিতাজী খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং এ ব্যাপারে তাঁর গভীর দুঃখের কথা জানিয়ে আমাকে পরিষ্কার বলে দেন, এখন আর এই ঘরে আমি আর তুমি দু'জনে এক সঙ্গে থাকতে পারি না। তুমি থাকলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব, নইলে তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। মালিকের ঘর যে ভেঙেছে আমি তার মুখ দেখতে চাই না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার মুখ কখনো আমাকে দেখাবে না। আমি ধারণাও করতে পারিনি এমনটা ঘটবে। আমি তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। তিনি আমাকে এও বলেন যে, এ ধরণের জালিমদের দরূণ এদেশ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে। অবশেষে রাগে-ক্ষোভে তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতে উদ্যত হলেন। আমি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে বললাম, আপনি বাড়ি ছেড়ে যাবেন না। আমি নিজেই আর এ বাড়িতে থাকতে চাইনে, যেখানে একজন রাম মন্দির ভক্তকে জালিম মনে করা হয়। এরপর আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসি এবং পানিপথে থাকতে শুরু করি।

প্রশ্ন. আপনি আপনার ইসলাম কবুলের ব্যাপারে কিছু বলুন?

উত্তর. প্রিয় ভাই আহমদ! আমার আল্লাহ কত মেহেরবান ও দয়ালু। তিনি চাননি আমি জুলুম ও অন্ধকারে হাবুডুবু খাই। যিনি আমাকে ইসলামের নূর ও হেদায়েত দ্বারা ধন্য করেছেন। আমার মতো জালিম যে কিনা তাঁর পবিত্র ঘরকে শহীদ করেছে সে-ই তাকে হেদায়েত দানে ধন্য করেছেন। ঘটনা ছিল, আমার বন্ধু যোগীন্দর বাবরী মসজিদের কিছু ইট এনে রেখেছিল এবং মাইক দিয়ে ঘোষণা দেয় যে, ইটগুলো রামমন্দিরের

ওপর নির্মিত অবকাঠামোর। সৌভাগ্যক্রমে তা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। সমস্ড় হিন্দু ভাই এসে যেন এর ওপর পেশাব করে। আর কি! ঘোষণা হতেই ভিড় লেগে গেল। যে-ই আসত ঘৃণা ভরে এর ওপর পেশাব করে যেত।

এবার মসজিদের যিনি মালিক তাঁর শান প্রদর্শনের পালা। চার-পাঁচ দিন পর যোগীন্দরের মস্ড়িষ্ক বিকৃতি ঘটে। সে পাগল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকতে শুরু করে। পরনে আদৌ কাপড় রাখত না। সম্মানিত জমিদার চৌধুরীর একমাত্র পুত্র ছিল সে। পাগলামীর পর্যায়ে সে বার বার তার মাকে কাপড় খুলে তাকে মুখ কালো করতে বলতো। তারপর ঐ অবস্থায় মাকে জড়িয়ে ধরত। তার পিতা এতে খুবই পেরেশান হয়ে পড়েন। ছেলের সুচিকিৎসার জন্য সাধু-সন্ন্যাসী ও আলিম-ওলামা দেখান। বার বার মহান মালিকের কাছে মাফ চাইতে থাকেন। দান-খয়রাত করতে থাকেন। কিন্তু তার অবস্থার উপশম না হয়ে বরং উত্তরোত্তর খারাপই হতে থাকে। একদিন তিনি বাইরে যেতেই সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে। মা চিৎকার করতে শুরু করলে মহল্লাবাসী ছুটে এসে তাকে রক্ষা করে। এরপর থেকে তাকে শেকলে বেঁধে রাখা হয়। যোগীন্দরের পিতা ছিলেন খুবই সম্মানিত লোক। তিনি এই ঘটনার কথা শুনে ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় কেউ তাঁকে বলে যে, এখানে সোনীপথে ঈদগাহর পাশে একটি মাদরাসা আছে। ওখানে একজন বড় মাওলানা সাহেব এসে থাকেন। একবার গিয়ে তাঁর সঙ্গে আপনি দেখা করুন। এরপর যদি কিছু না হয় তখন যা হয় করবেন।

তিনি সোনীপথে যান। গিয়ে জানতে পারেন, মাওলানা সাহেব তো মাসের পয়লা তারিখে আসেন। বিগত পরশু পয়লা জানুয়ারি তারিখে এসে তিনি ২রা তারিখে চলে গেছেন। চৌধুরী সাহেব খুব হতাশ হন এবং ঝাড়-ফুঁক করনেওয়ালা কাউকে পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করেন। জানা গেল মাদরাসার যিম্মাদার কারী সাহেব ঝাড়-ফুঁক করে থাকেন, কিন্তু তিনিও মাওলানা সাহেবের সঙ্গে সফরে বেরিয়ে গেছেন। এরপর ঈদগায় জনৈক দোকানদার তাকে মাওলানা সাহেবের দিল্লীর ঠিকানা দিয়ে দেয় এবং এও জানায় যে, আগামী পরশু বুধবার হযরত মাওলানা এখানে আসার (বুওয়ানা, দিল্লী) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি তখন তাঁর ছেলেকে শেকলে বেঁধে বুওয়ানার ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে যান। তিনি ছিলেন আপনার আব্বার

মুরীদ এবং বহুদিন থেকে বুওয়ানার জন্য তারিখ নিতে চাইতেন। মাওলানা সাহেব প্রত্যেকবার তার কাছে ওযর-আপত্তি এবং অপারগতা প্রকাশ করতেন। এবারে তিনি এদিককার সফরে দু'দিন পর যোহরের নামায পড়ার ওয়াদা করে গেছেন।

বুওয়ানার ইমাম সাহেব তাঁকে বলেন যে, অবস্থা খারাপ হবার দরুন ৬ ডিসেম্বরের আগে হরিয়ানার বহু ইমাম ও মুদাররিস এখান থেকে ইউ.পি.তে নিজেদের বাড়ি-ঘরে চলে গিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক মাস পর্যন্ত ফিরে আসেননি। এ জন্য মাওলানা সাহেব ১ তারিখে এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতায় বিরাট জোর দিয়ে একথা বলেন যে, মুসলমানরা এসব অমুসলিম ভাইকে যদি ইসলামের দাওয়াত দিতেন এবং ইসলাম, আল্লাহ ও মসজিদের পরিচয় তুলে ধরতেন তাহলে এ ধরণের দুর্ঘটনার জন্ম হতো না। তিনি বলেন যে, বাবরী মসজিদের শাহাদতের যিম্মাদার এক দিক দিয়ে আমরা মুসলমানরাও। আর এখনও যদি আমাদের হুঁশ হয় এবং আমরা যদি দাওয়াতের হক আদায় করতে থাকি তাহলে এই মসজিদ যারা ভেঙেছে, এই মসজিদ যারা ধ্বসিয়েছে তারা মসজিদ নির্মাতা হতে পারে। হতে পারে তারাই মসজিদ আবাদকারী। ঠিক এ ধরনের প্রেক্ষাপটে আমাদের রাসূল হাদীয়ে বরহক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমার জাতিকে হেদায়েত দান কর, সুপথ প্রদর্শন কর। কেননা তারা তো জানে না।

যোগীন্দরের পিতা চৌধুরী রঘুবীর সিং যখন বুওয়ানার ইমাম (সম্ভবত তাঁর নাম ছিল মাওলানা বশীর আহমদ)-এর কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন, সে সময় তাঁর পীর সাহেবের বক্তৃতার খুবই প্রভাব ছিল। তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেন, আমি ঝাড়-ফুঁক করতাম। কিন্তু আমাদের হযরত আমাকে একাজ করা থেকে থামিয়ে দিয়েছেন। কেননা একাজে অনেক সময় মিথ্যা বলতে এবং মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হয়। আর আপনার ছেলের ওপর তো কোন জাদু কিংবা জিন-ভুতের আছরও নেই বরং এ তো সেই মালিকের আযাবের ফল । আপনার জন্য একটি সুযোগ আছে। আমাদের বড় হযরত আগামী পরশু বুধবার দুপুরে এখানে আসছেন। আপনি তখন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন এবং আপনার কথা তাঁকে বলুন। আপনার ছেলে আশা করি ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাকে একটি কাজ করতে হবে

আর তা হলো, আপনার ছেলে যদি ভালো হয়ে যায় তবে আপনাকে মুসলমান হতে হবে। চৌধুরী সাহেব বললেন, আমার ছেলে ভালো হয়ে গেলে আমি সব কিছু করার জন্য তৈরী আছি।

তৃতীয় দিন ছিল বুধবার। চৌধুরী রঘুবীর সিং যোগীন্দরকে নিয়ে সকাল ৮ টার সময় বুওয়ানা পৌঁছেন। দুপুর বেলা যোহরের আগেই মাওলানা সাহেবের আগমন ঘটে। শেকলে বাঁধা যোগীন্দর সম্পূর্ণ দিগম্বর অবস্থায় দাঁড়ানো। চৌধুরী সাহেব কাঁদতে কাঁদতে মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপর পড়ে যান এবং বলতে থাকেন, মাওলানা সাহেব! আমি এই আহম্মকটাকে খুবই ঠেকাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে পানিপথের এক কুচক্রীর চক্রান্তে পড়ে। মাওলানা সাহেব! আমার ওপর দয়া করুন। আমাকে মার্জনা করে দিন। আমার ঘর বাঁচান। মাওলানা সাহেব কঠোর ভাষায় তাকে মাথা তুলতে বলেন এবং পুরো ঘটনা শোনেন।

তিনি চৌধুরী সাহেবকে বলেন যে, সমগ্র জগত সংসার নিয়ন্ত্রণকারী সর্বশক্তিমান আল্লাহর ঘর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে তারা এত বড় পাপ করেছে এবং এত বড় জুলুম করেছে যে, যদি তিনি গোটা বিশ্বচরাচর ধ্বংস করে দেন তাহলে তা যথার্থ হবে। এতো বরং কমই হয়েছে যে, এই পাপের বোঝা কেবল একাকী তার ওপর পড়েছে। আমরাও সেই সর্বশক্তিমান মালিকেরই বান্দা এবং এক দিক থেকে এই বিরাট পাপের অংশীদার আমরাও। আর তা এই দিক দিয়ে যে, আমরা তাদেরকে বোঝাবার হক আদায় করিনি, যারা বাবরী মসজিদ শহীদ করেছে। এখন আমাদের আয়ত্ত্বে আর কিছু নেই। আমরা কেবল এতটুকু করতে পারি যে, আপনি সেই মালিকের সামনে কাঁদেন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চান। আর আমরাও ক্ষমা চাই।

এরপর মাওলানা সাহেব বললেন, যতক্ষণ না আমরা মসজিদের প্রোগ্রাম থেকে মুক্ত হই আপনি গভীর ধ্যানের সাথে ও মনোযোগ সহকারে মালিকের কাছে সত্যিকার অন্তর দিয়ে মাফ চান এবং প্রার্থনা করতে থাকুন যে, মালিক! আমার বিপদ কেবল আপনিই দূর করতে পারেন, আর কেউ দূর করতে পারবে না।

এরপর চৌধুরী সাহেব আবার মাওলানা সাহেবের পায়ের ওপরে পড়ে গেলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলেন, জ্বী! আমার যদি সেই ক্ষমতা থাকতো; তাহলে কি আমাকে এই দিন দেখতে হতো! আপনি

মালিকের আপনজন। যা কিছু করার আপনিই করুন।

মাওলানা সাহেব তখন তাকে বললেন, আপনি আমার কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছেন। এখন যেই চিকিৎসার কথা আমি বলছি তা আপনার করা উচিত। এবার তিনি সম্মত হলেন। মাওলানা সাহেব মসজিদে গেলেন। নামায পড়লেন। অল্প সময়ের জন্য উপস্থিত লোকদের সামনে বক্তৃতাও দিলেন এবং দোয়া করলেন। মাওলানা সাহেব সকলকেই চৌধুরী সাহেবের জন্য দোয়া করতে বললেন। প্রোগ্রাম শেষ হবার পর মসজিদে নাশতা হল। নাশতা থেকে মুক্ত হবার পর মসজিদ থেকে বের হতেই আল্লাহর কী মেহেরবানী দেখুন, যোগীন্দর তার পিতার মাথা থেকে পাগড়ী টেনে নিয়ে তার উলঙ্গ শরীর ঢাকল এবং দিব্যি সুস্থ মানুষের মতো তার পিতার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সকলেই এ দৃশ্য দেখে আনন্দিত হলেন। বুওয়ানার ইমাম সাহেবের খুশির তো অন্ত ছিল না। তিনি চৌধুরী সাহেবকে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁকে এও বলে ভয় দেখালেন যে, যেই মালিক তাকে ভালো করে দিয়েছেন যদি তুমি ওয়াদা মাফিক মুসলমান না হও তাহলে সে আবার এর চেয়ে আরও বেশি মারাত্মক পাগল হতে পারে। চৌধুরী সাহেব তৈরি হলেন এবং ইমাম সাহেবকে বললেন, মাওলানা সাহেবের ঋণ আমার সাত পুরুষ পর্যন্ত শোধ করতে পারবে না। আমি আপনার গোলাম। আপনি যেখানে চান আমাকে বিক্রী করতে পারেন। হযরত মাওলানা এ কথা শুনতেই ইমাম সাহেব তার সুস্থ হবার ব্যাপারে যে এধরনের ওয়াদা নিয়েছিলেন, তাতে ইমাম সাহেবকে বোঝালেন যে, এ ধরনের কাজ ঠিক নয়, তাকওয়া পরিপন্থী।

এরপর চৌধুরী সাহেবকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হতেই যোগীন্দর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করল, পিতাজী! আপনি, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, মুসলমান হতে। তখন যোগীন্দর বলল, আমাকে তো আপনার আগে মুসলমান হতে হবে এবং আমাকে বাবরী মসজিদ পূণর্বার অবশ্যই নির্মাণ করতে হবে। তারপর তাঁরা উভয়ে খুশি মনে ওযু করলেন। তাঁদেরকে কলেমা পড়ানো হল। পিতার নাম মুহাম্মদ উছমান এবং পুত্রের নাম মুহাম্মদ ওমর রাখা হল। এরপর তাঁরা খুবই খুশি হয়ে নিজেদের গ্রামে ফিরে গেলেন। গ্রামে একটি ছোট মসজিদ ছিল। তাঁরা মসজিদের ইমাম

সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইমাম সাহেব স্থানীয় মুসলমানদেরকে তাঁদের পিতা-পুত্রের মুসলমান হবার কথা জনিয়ে দিলেন। ফলে একজন দু'জনের কান থেকে গোটা এলাকায় একথা ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দুদের কান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে এলাকার প্রতাপশালী হিন্দুদের এ নিয়ে মিটিং হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁদের দু'জনকেই রাতের বেলা মেরে ফেলতে হবে। অন্যথায় তাঁরা অনেক লোকের ধর্ম নষ্ট করে দেবে। তাদের এই মিটিংয়ে একজন ধর্মত্যাগী মুরতাদ উপস্থিত ছিল। সে ইমাম সাহেবকে গোপনে তাদের চক্রান্তের কথা জানিয়ে দেয়। ফলে আল্লাহর মেহেরবানীতে রাতের অন্ধকারে তাদেরকে গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। তাঁরা ফুলাত গিয়ে পৌঁছেন। পরে তাঁদেরকে ৪০ দিনের জন্য তবলীগ জামায়াতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আমীর সাহেবের পরামর্শে যোগীন্দর (ওমর) তিন চিল্লাও দেয়। পরে যোগীন্দরের মা-ও মুসলমান হয়ে যায়।

অতঃপর মুহাম্মদ ওমর (যোগীন্দর)-এর বিয়ে হয় দিল্লীর এক ভালো মুসলিম পরিবারে। এখন তারা বেশ আনন্দের সঙ্গেই দিল্লীতে সপরিবারে বসবাস করছেন। গ্রামের জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি সব বিক্রী করে তাঁরা দিল্লীতে একটি কারখানা দিয়েছেন।

প্রশ্ন. মাস্টার সাহেব! আমি আপনাকে আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। আমি জানতে চেয়েছিলাম আপনি কিভাবে মুসলমান হলেন? আপনি যোগীন্দরের ও তার পরিবারের (মুসলমান হবার) কাহিনী শোনালেন। যদিও তা খুবই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর, কিন্তু আমি তো আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাই, কিভাবে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন সে সম্পর্কে।

উত্তর. প্রিয় ভাইটি আমার! আসলে আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী এর থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। এজন্য আমি এর প্রথম অংশ শোনালাম। এখন দ্বিতীয় অংশও শুনুন।

১৯৯৩ সালের ৯ মার্চ আমার পিতা অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। বাবরী মসজিদের শাহাদত এবং তাতে আমার অংশগ্রহণ তাঁকে খুবই আঘাত দিয়েছিল। তিনি প্রায় আমার মাকে বলতেন, মালিক আমাকে

মুসলমানদের মধ্যে জন্ম দিলেন না কেন? আমি যদি মুসলমানদের ঘরে জন্ম নিতাম তাহলে অন্তত জুলুম-নিপীড়ন সহ্যকারীদের তালিকায় আমার নাম থাকত। তিনি আমার পরিবারের লোকদেরকে ওসিয়ত করেছিলেন, আমি মারা গেলে আমার লাশের খাটিয়ার (আরতির) কাছে যেন বলবীর না আসে, প্রথা ও রেওয়াজ মাফিক আগুনে যেন পোড়ানো না হয়। হিন্দুদের শ্মশানে যেন না নেওয়া হয়। পরিবারের লোকেরা তাঁর অন্তিম ইচ্ছা মুতাবিক সব কিছু করে। আট দিন পর আমি আমার পিতার মৃত্যুর খবর পাই। এতে আমার মন ভেঙে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর বাবরী মসজিদ ভাঙ্গা আমার কাছে জুলুম মনে হতে থাকে এবং গর্বের পরিবর্তে আফসোস হতে থাকে। আমার দিল্ যেন হঠাৎ দপ করে নিভে যায়। আমি বাড়ি গেলে মা আমার পিতার কথা স্মরণ করে কাঁদতে থাকেন এবং বলতে থাকেন যে, এমন দেবতার মতো বাপকে তুই কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললি! তুই কতটা নিচ ও হীন জাতের মানুষ। মায়ের এ ধরনের আচরণের কারণে আমি বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিই।

জুন মাসে মুহাম্মদ ওমর (যোগীন্দর) তাবলীগ জামায়াত থেকে ফিরে এল। সে পানিপথে আমার সঙ্গে দেখা করল এবং তার পুরো ঘটনা আমাকে বলল। বিগত দু'মাস থেকে আমার মন সব সময় ভীত-সন্ত্রস্ড় থাকত, না জানি কোন আসমানী বালা-মুসীবত আমার ওপর এসে পড়ে। পিতার দুঃখ ও মনোকষ্ট এবং বাবরী মসজিদের শাহাদতের দরুন আমার মন সব সময় সন্দিগ্ধ থাকত। মুহাম্মদ ওমরের কথা শুনে আমি আরও বেশি পেরেশান হয়ে পড়লাম। ওমর ভাই আমাকে আরও বেশি জোর দিলেন, আমি যেন ২৩ জুন তারিখে সোনীপথে যখন মাওলানা সাহেব আসবেন তাঁর সাথে গিয়ে অবশ্যই দেখা করি। আরও ভালো হয় যদি তাঁর সঙ্গে আমি কিছু দিন থাকি। আমি প্রোগ্রাম বানালাম। কিন্তু পৌঁছুতে আমার কিছুটা দেরি হয়। ওমর ভাই আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল এবং মাওলানা সাহেবকে আমার অবস্থা সম্পর্কে সব বলেছিল। আমি সেখানে গেলে মাওলানা সাহেব আমাকে সাগ্রহে কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন, আপনার আন্দোলনে এই গুনাহ করার জন্য যোগীন্দরের সঙ্গে যদি সর্বময় মালিক এরূপ করতে পারেন তাহলে আপনার সঙ্গেও একই রূপ ব্যবহার করা হতে পারে। আর মালিক যদি এই জগতে শাস্ড়ি নাও দেন তাহলে মৃত্যুর পর চিরস্থায়ী জীবনে যেই শাস্ড়ি মিলবে আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

এক ঘণ্টা সাথে থাকার পর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আসমানী বালার হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, মুসলমান হওয়া দরকার। মাওলানা সাহেব দু'দিনের জন্য বাইরে কোন সফরে যাচ্ছিলেন। আমি আরও দু'দিন তাঁর সাথে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলাম। তিনি খুব খুশি হয়েই অনুমতি দিলেন। একদিন হরিয়ানা, এরপর দিল্লী ও খোর্জার সফর ছিল। দু'দিন পর তিনি ফুলাত ফিরে এলেন। এ দু'দিন আমার মন ইসলাম গ্রহণের জন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমি ওমর ভাইকে আমার ইচ্ছার কথা বললাম। সে খুব খুশি হয়ে মাওলানা সাহেবকে তা জানাল। আলহামদুলিল্লাহ! ২৫ জুন ১৯৯৩ বাদ যোহর আমি ইসলাম কবুল করি। মাওলানা সাহেব আমার নাম রাখেন মুহাম্মদ আমের। ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা এবং নামাযের নিয়ম-কানুন ও দরকারী মাসলা-মাসায়েল শেখার জন্য তিনি আমাকে কিছুদিন ফুলাত থাকার পরামর্শ দিলেন। আমি আমার স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাদের সমস্যার কথা বললে তিনি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি কয়েক মাস ফুলাত এসে থাকলাম এবং আমার স্ত্রীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কাজ করতে থাকি। তিন মাস পর আলহামদুলিল্লাহ! আমার স্ত্রীও মুসলমান হয়ে যায়।

প্রশ্ন. আপনার মা'র কী হল?

উত্তর. আমি আমার মাকে আমার মুসলমান হবার ব্যাপারে জানালে তিনি খুব খুশি হন এবং বলেন, তোর বাপের আত্মা এতে শান্তি পাবে। আমার মাও ঐ বছরেই মুসলমান হন।

প্রশ্ন. এখন আপনি কী করছেন?

উত্তর. বর্তমানে আমি একটি জুনিয়ার হাইস্কুল চালাচ্ছি। স্কুলে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে ইংলিশ মিডিয়াম শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন. আব্বা বলছিলেন, আপনি হরিয়ানা, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন জায়গায় অনাবাদী মসজিদগুলো পুনরায় আবাদ করার জন্য চেষ্টা করছেন ?

উত্তর. ওমর ভাইয়ের সাথে মিলে একত্রে আমরা প্রোগ্রাম বানিয়েছি যে, আল্লাহর ঘর শহীদ করে আমরা যেই বিরাট গুনাহ করেছি তার কাফ্ফারা হিসেবে আমরা বিরান মসজিদগুলো আবাদ করব এবং নতুন নতুন মসজিদ বানাব। আমরা দু'জনে মিলে আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেব। আমি বিরান মসজিদগুলো আবাদ করব আর ওমর

ভাই নতুন নতুন মসজিদ বানাতে চেষ্টা চালাবেন এবং এ ব্যাপারে মসজিদ বানাবার ও সেগুলো লোকে ভরপুর করাবার কর্মসূচী হাতে নিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! ২০০৪ ইং সালের ৬ নভেম্বর পর্যন্ত এই পাপী ১৩টি বিরান ও অধিকৃত মসজিদ হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লী ও মীরাট সেনানিবাস এলাকায় আবাদ করেছে। এব্যাপারে ওমর ভাই আমার চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত সে বিশটি মসজিদ তৈরি করেছে এবং একুশতম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আমরা উভয়ে এইসিদ্ধান্তও নিয়েছি, বাবরী মসজিদের প্রত্যেক শাহাদত বার্ষিকীতে ৬ ডিসেম্বর তারিখে একটি বিরান ও অনাবাদী মসজিদে অবশ্যই নামায শুরু করাতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা আজ পর্যন্ত কোন বছরেই এটা করতে ব্যর্থ হইনি। অবশ্য শ'য়ের লক্ষ্য পূরণ এখনও অনেক দূরে। আশা করছি এবছর এর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। আটটি মসজিদ সম্পর্কে কথাবার্তা চলছে। আশা করি, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সেগুলো আবাদ হয়ে যাবে। ওমর ভাই অনেক আগেই তো লক্ষ্য অর্জনে আমার চেয়ে এগিয়ে আছে। আর আসলে আমার কাজও তো তারই ভাগে পড়ে। আমাকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসার মাধ্যম তো মূলত সেই।

প্রশ্ন. আপনার খান্দানের কথা কিছু বলুন কী অবস্থা তাদের ?

উত্তর. আমার ছাড়া আমাদের পরিবারে আমার এক বড় ভাই আছেন। আমার ভাবী চার বছর আগে মারা গেছেন। ভাইয়ের বিয়ে হয়েছিল আমার বিয়ের পর। তাঁর চারটি ছোট ছোট বাচ্চা আছে। একটি বাচ্চা কিছুটা প্রতিবন্ধী ধরনের। আমার ভাবী ছিলেন খুবই ভালো মহিলা। আদর্শ স্ত্রীর মতোই তিনি ভাইয়ের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। ভাবীর মৃত্যু শোকে ভাইটা আমার পাগল প্রায় হয়ে পড়েছিলেন। ভাবীর মৃত্যুর পর আমার স্ত্রী তাঁর ছেলেমেয়েদের খুবই সেবা-যত্ন করে। আমার বড় ভাই ছিলেন খুবই শরীফ ও সজ্জন মানুষ। তিনি আমার স্ত্রীর সেবায় খুবই প্রীত হন। আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেই। কিন্তু আমার আচরণে আমার পিতার দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণে তিনি আমাকে ভালো মানুষ মনে করতেন না। আমি আমার স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করলাম, আমাদের ছেলেমেয়েরা কিছুটা বড় হয়ে গেছে। আর আমার ভাই ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে

খুব বিপদে আছেন। বেশ ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে তাঁকে। ভালো হয় যদি আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিই আর ইদ্দত পালনের পর ভাই রাজী হলে মুসলমান হয়ে তোমাকে বিয়ে করল। এতে আমাদের উভয়ের জন্য নাজাতের ব্যবস্থা হতে পারে।

প্রথমে তো সে রাজী হয়নি এবং এ ধরনের প্রস্ড়াব তার কাছে খুবই খারাপ মনে হয়। কিন্তু আমি যখন তাকে আন্তরিক ভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করলাম তখন সে রাজী হল। এরপর আমি আমার ভাইকে বোঝালাম যে, এসব অবুঝ ছেলেমেয়ের জীবন বাঁচাবার স্বার্থে আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান আর আমার স্ত্রীকে বিয়ে করেন তাহলে ক্ষতি কী? কেননা এমন মহিলা পাওয়া কঠিন হবে যে এসব বাচ্চাকে মায়ের স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করবে। শুরুতে তিনি এপ্রস্ড়াব খুব খারাপ মনে করেন যে, লোকে কী বলবে? আমি বললাম, যুক্তি-বুদ্ধির নিরীখে কাজটি যদি সঠিক হয়, তাহলে তা মানতে ক্ষতি কি? আমাদের পরামর্শ হল। আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিলাম। ইদ্দত পালন শেষ হলে আমার ভাইকে কলেমা পড়িয়ে তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! তাঁরা এখন খুব সুখে-শান্তিতে ঘর করছে। আমার ছেলেমেয়েরাও এখন সেখানে এক সাথেই থাকে।

প্রশ্ন. আপনি তাহলে একা থাকেন?

উত্তর. না, হযরত মাওলানার পরামর্শে একজন বয়স্ক নওমুসলিম মহিলাকে বিয়ে করেছি। আলহামদুলিল্লাহ! আমরাও আনন্দের সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করছি।

প্রশ্ন. আরমুগানের পাঠকদের জন্য আপনি কি কিছু বলবেন?

উত্তর. সকল মুসলমানের কাছে আমার একটিই নিবেদন আর তাহলো, নিজের জীবনের লক্ষ্য কি তা জেনে এবং ইসলামকে মানবতার আমানত মনে করে একে মানুষের কাছে পোঁছে দিই, পৌঁছে দেবার কথা ভাবি। কেবল ইসলামের প্রতি দুশমনীর কারণে তার থেকে বদলা নেবার প্রতিশোধ গ্রহণে উৎসাহিত না হই। আহমদ ভাই! আমি একথা একেবারে আমার

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, বাবরী মসজিদ শাহাদতে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক শিবসেনা, বজরং দলের সদস্যসহ সকল হিন্দু যদি এটা জানত যে, ইসলাম কী! মুসলমান কাকে বলে? কুরআনুল করীম কী? মসজিদ আসলে কোন বস্তুর নাম, তাহলে তাদের সকলেই মসজিদ নির্মাণের কথা ভাবতে পারত, মসজিদ ভাঙ্গার প্রশ্নই উঠতে পারতো না। আমি আমার প্রবল প্রত্যয় থেকে বলছি, বাল থ্যাকার, উইরে কুঠিয়ার যদি ইসলামের প্রকৃত সত্য ও মর্মবাণী জানতে পারে এবং জানতে পারে যে, ইসলাম (কেবল মুসলমানদের নয়) আমাদেরও ধর্ম, এটি আমাদের দরকার তাহলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ খরচে বাবরী মসজিদ পূণর্বার নির্মাণ করাকে নিজেদের সৌভাগ্য ভাববে।

আহমদ ভাই! সে যাকগে, কিছু লোকতো এমন আছে যারা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় বিখ্যাত, কিন্তু এখন একশ কোটি হিন্দুর মধ্যে এমন লোক এক লক্ষও হবে না। সত্য কথা বলতে কি, আমি বোধহয় বাড়িয়ে বলছি, ৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ লোক তো আমার পিতার মত, যারা মানবতার বন্ধু বরং ইসলামী নীতিসমূহকে তারা অন্তর দিয়েই পছন্দ করে। আহমদ ভাই! আমার পিতা (কাঁদতে কাঁদতে) কি স্বভাবগতভাবে মুসলমান ছিলেন না? কিন্তু মুসলমানরা তাঁকে দাওয়াত না দেবার কারণে তিনি কুফরী অবস্থায় মারা গেছেন। আমার সঙ্গে, আমার পিতার সঙ্গে মুসলমানদের এ কত বড় জুলুম। এ কথা সত্যি যে, বাবরী মসজিদ যে শহীদ করেছে সেই আমার থেকে বড় জুলুমকারী জালিম আর কে হতে পারে? কিন্তু আমার চেয়েও বড় জালিম তো সেই সব মুসলমান যাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে অলসতা ও অবহেলার দরুন আমার এমন প্রিয় বাবা আজ দোযখে চলে গেছেন। মাওলানা সাহেব সত্য বলেছেন, আমরা যারা বাবরী মসজিদ শহীদ করেছি তারা না জানার কারণে এবং মুসলমানদের না চেনার দরুন এমন জুলুম করেছি। আমরা অজানা ও অজ্ঞতার দরুন এ ধরনের জুলুম করেছি এবং মুসলমানেরা জেনে বুঝে তাদের দোযখে যাবার উপলক্ষে পরিণত হচ্ছে। আমার পিতার কুফরী অবস্থায় মারা যাবার কথা যখন রাত্রে মনে হয় তখন আমার ঘুম পালিয়ে যায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমার ঘুম আসে না।

ঘুম আনবার জন্য আমাকে ঘুমের বড়ি খেতে হয়। হায়! মুসলমানদের যদি এই ব্যথার অনুভূতি হতো!

প্রশ্ন. বহুত বহুত শুকরিয়া, মাশাআল্লাহ্! আপনার জীবন আল্লাহর হাদী নামক সিফত এবং ইসলামের সত্যতার খোলা নিদর্শন।

উত্তর. নিঃসন্দেহ আহমদ ভাই। এজন্য আমার অভিলাষ ছিল যে, আরমুগানের পাতায় এ কাহিনী ছাপা হোক। আল্লাহ তা'আলা এর প্রকাশনাকে মুসলমানদের চোখ খুলবার মাধ্যম বানান। আমীন! আল্লাহ হাফেজ।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান,জুন ২০০৫ ইং